#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

9th to 14th Feb 2026

RICE IAS

সূচক

1. **জেনারেল স্টাডিজ ১** — **01**
    - 1.1. সমাজ — 01
        - 1.1.1. শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ — 01

2. **জেনারেল স্টাডিজ ২** — **05**
    - 2.1. রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা — 05
        - 2.1.1. সংবিধান যখন পবিত্র আঙিনায়: ভারতে ধর্মীয় বিবাদের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা — 05

3. **জেনারেল স্টাডিজ ৩** — **10**
    - 3.1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি — 10
        - 3.1.1. আসন্ন এআই (AI) বিপ্লব এবং এর বৈশ্বিক প্রভাব — 10
        - 3.1.2. SHANTI আইন এবং ভারতের পারমাণবিক রূপান্তর — 13
    - 3.2. অর্থনীতি — 16
        - 3.2.1. সংশোধিত শ্রমবিধি: মজুরি কাঠামোর সংস্কার ও শ্রমিক সশক্তিকরণ — 16

4. **জেনারেল স্টাডিজ ৪** — **20**
    - 4.1. নীতিশাস্ত্র — 20
        - 4.1.1. খননযোগ্য সত্তা – পরবর্তী বড় পণ্য হিসেবে মানবজীবন — 20

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

জেনারেল স্টাডিজ ১

1.1. সমাজ

1.1.1. শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে তিন বোনের মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনা কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর **সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব** নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক তদন্তে **স্ক্রিন আসক্তি** (অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার) এবং পারিবারিক কলহের বিষয়গুলি উঠে এসেছে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত বিভিন্ন উদাহরণের মতো ভারতেও সোশ্যাল মিডিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবি উঠছে।
- যাইহোক, এই ধরনের **কঠোর বা একতরফা নীতি** অনিচ্ছাকৃতভাবে নাবালকদের ডিজিটাল অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে এবং প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোকে তাদের **কাঠামোগত দায়বদ্ধতা** থেকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারে। তাই এখন সময় এসেছে একটি **সুস্থ মিডিয়া বাস্তুতন্ত্র বা পরিবেশের** দিকে নজর দেওয়ার।

সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বিমুখী প্রভাব

1. **শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার সুফল**

   বৈধ উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও, একটি ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল সমাজে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো শিশুদের বিকাশ এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু **গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা** প্রদান করে:

   - **তথ্য প্রাপ্তি এবং শিক্ষা:** এটি গতানুগতিক শিক্ষার বাইরেও বিভিন্ন **শিক্ষামূলক কন্টেন্ট**, নতুন দক্ষতা অর্জনের উপায় এবং সম্মিলিতভাবে শেখার সুযোগ তৈরি করে দেয়।
   - **সৃজনশীল প্রকাশ:** এটি শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা প্রকাশের একটি পথ খুলে দেয়, যা শিশুদের **কল্পনাশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা** বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
   - **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সহায়তা:** এটি প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর জন্য (যেমন- LGBTQIA+ **তরুণ-তরুণী**, প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রত্যন্ত বা সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের শিশু) একটি লাইফলাইন হিসেবে কাজ করে। এটি এমন এক **সহমর্মী নেটওয়ার্ক** তৈরি করে যা অফলাইনে হয়তো পাওয়া সম্ভব হয় না।
   - **ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি:** অল্প বয়স থেকে এই মাধ্যমগুলোর সাথে যুক্ত থাকলে শিশুদের **মিডিয়া সাক্ষরতা**, যোগাযোগের দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা তৈরি হয়, যা ভবিষ্যতে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য অপরিহার্য।
   - **নাগরিক এবং সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ:** এটি শিশুদের বিভিন্ন **সামাজিক কর্মকাণ্ড**, সচেতনতামূলক অভিযান এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ে অংশ নিতে উৎসাহিত করে, যা তাদের একজন সচেতন ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।
   - **সামাজিক গতিশীলতা এবং লিঙ্গ সাম্য:** সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য ও সুযোগের পরিধি বাড়িয়ে দেয়, যা বিশেষ করে মেয়েদের জন্য খুব উপকারী।
     - **তথ্য:** ভারতের **ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে** (NSS) অনুযায়ী, ভারতে মাত্র **৩৩.৩% নারী** ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার **৫৭.১%**।

2. **শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা**

শিশুদের গঠনমূলক বয়সে স্বাস্থ্য, আচরণ এবং নিরাপত্তার ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার বহুমুখী প্রভাবের কারণে এটি নিষিদ্ধ বা সীমিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়:

- **জ্ঞানীয় কার্যকারিতার ওপর প্রভাব:** অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনে ব্যয় করার ফলে মনোযোগের অভাব, একাগ্রতা হ্রাস এবং তথ্য মনে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, যা সরাসরি শিক্ষাগত পারফরম্যান্সের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি:** দীর্ঘসময় ধরে আসক্তিমূলক ব্যবহারের ফলে উদ্বেগ, বিষণ্নতা, হীনম্মন্যতা এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া ADHD-এর মতো মনোযোগজনিত ব্যাধিও বৃদ্ধি পায়।
- **শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি:** আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপিত কন্টেন্ট দীর্ঘক্ষণ দেখার ফলে শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাসে অনিয়ম এবং নিজের শরীর সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা তৈরি হয়। এটি ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার জন্ম দেয়।
- **সামাজিক বিকাশে বাধা:** ভার্চুয়াল কথোপকথনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা সরাসরি কথা বলার প্রবণতা কমিয়ে দেয়, যার ফলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং আবেগীয় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।
- **অনলাইন নিরাপত্তা ও শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি:** শিশুরা ক্রমশ সাইবার বুলিং (অনলাইনে হেনস্থা), যৌন শোষণ এবং বয়স-অনুপযোগী বা ক্ষতিকর কন্টেন্টের শিকার হওয়ার ঝুঁকির মুখে পড়ছে।
- **বিপজ্জনক ভাইরাল ট্রেন্ডের প্রভাব:** অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জসমূহ (যেমন দম আটকে রাখা বা অপরাধমূলক প্রবণতা) শিশুদের শারীরিক ক্ষতি এবং আইনি সমস্যার মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
- **অপর্যাপ্ত অভিভাবকীয় তত্ত্বাবধান:** শহুরে এবং কর্মজীবী বাবা-মায়ের পরিবারে শিশুদের ওপর নজরদারি সীমিত হওয়ায় অনিয়ন্ত্রিত স্ক্রিন টাইম বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শৈশবকে ডিভাইস-নির্ভর করে তুলছে।
- **অ্যালগরিদম-চালিত আসক্তি:** সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদমগুলো এমনভাবে তৈরি যা ব্যবহারকারীকে বেশিক্ষণ আটকে রাখে। এটি শিশুদের পক্ষে ফোন থেকে দূরে থাকা কঠিন করে তোলে এবং আসক্তি বাড়ায়।

শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

স্ট্যানলি কোহেনের **'মোরাল প্যানিক'** ধারণা অনুযায়ী, এ ধরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে "অশুভ শক্তি" হিসেবে চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণের একটি মিথ্যা আশ্বাস তৈরি করে। এটি মূলত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণের কাঠামোগত অভাব থেকে নজর ঘুরিয়ে দেয়। এর চ্যালেঞ্জগুলো বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ পায়:

- **বয়স যাচাইকরণ এবং গোপনীয়তা সংক্রান্ত উদ্বেগ:** নির্ভরযোগ্য বয়স যাচাইকরণ ব্যবস্থা না থাকায় শিশুরা VPN বা অন্য উপায়ে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যায়। সরকারি পরিচয়পত্র বা বায়োমেট্রিক যাচাইকরণের মতো পদক্ষেপগুলো ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
- **অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা:** ঢালাও নিষেধাজ্ঞা জারি করলে গেম বা যোগাযোগের প্ল্যাটফর্মগুলোও (যেমন PUBG বা Instagram) এর আওতায় চলে আসতে পারে, যা সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় বাধা সৃষ্টি করবে।
- **অনিরাপদ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে চলে যাওয়া:** যেহেতু নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা কঠিন, তাই শিশুরা আরও অনিয়ন্ত্রিত এবং এনক্রিপ্টেড প্ল্যাটফর্ম বা **'ডার্ক ওয়েব'**-এ চলে যেতে পারে, যা তাদের ক্ষতির ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।
- **অধিকার-সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং বঞ্চনা:** নিষেধাজ্ঞা জারি করলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে। এটি বিশেষ করে প্রান্তিক গোষ্ঠী বা LGBTQIA+ তরুণদের ওপর প্রভাব ফেলে যারা অনলাইনের সহায়তামূলক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল।
- **ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনে বাধা:** অ্যাক্সেস সীমিত করলে সৃজনশীলতা, শিক্ষামূলক সহযোগিতা এবং আগ্রহ-ভিত্তিক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়, যা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা তৈরির প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়।

ভারতে ঢালাও নিষেধাজ্ঞা কেন কার্যকর হবে না

বিদেশের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ভারতের অনন্য সামাজিক ও প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে, যা গণতান্ত্রিক ঘাটতি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতির কারণ হতে পারে।

- **প্রযুক্তিগত ছিদ্র:** ভারতের বিশাল ডিজিটাল জনসংখ্যার কারণে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা অবাস্তব।
- **প্রেক্ষাপটের বৈচিত্র্য:** সব ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করলে ভারতের শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্য উপেক্ষিত হয়।
- **গণতান্ত্রিক ঘাটতি:** শিশুদের সাথে পরামর্শ না করেই প্রায়শই নীতি নির্ধারণ করা হয়, যা তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে (agency) অবজ্ঞা করে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর কাছে নিয়ম মানার বিষয়টি কার্যকরভাবে তদারকি করার মতো প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব রয়েছে।
- **রাষ্ট্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের ঝুঁকি:** সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সাথে পরিচয়পত্র যাচাইকরণ যুক্ত করলে তা নাগরিক স্বাধীনতাকে সংকুচিত করতে পারে।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিশুদের সুরক্ষায় ভারতের উদ্যোগ

ভারত প্রতিরোধ, সম্মতি এবং প্রয়োগের ওপর জোর দিয়ে একটি বহুমুখী কাঠামো তৈরি করেছে।

- **ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩:** ১৮ বছরের কম বয়সীদের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য অভিভাবকদের যাচাইযোগ্য সম্মতি বাধ্যতামূলক করে।
- **আইটি (IT) আইন ২০০০, ধারা ৬৭বি:** শিশুদের যৌন নির্যাতনমূলক কন্টেন্ট (CSAM) প্রকাশ, প্রচার বা দেখার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দেয়।
- **শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৬:** যৌন অপরাধকে অগ্রাধিকার দিয়ে অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
- **পকসো (POCSO) আইন, ২০১২:** ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের শোষণ থেকে রক্ষা করে এবং শিশু-কেন্দ্রিক বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।
- **NCPCR-এর কার্যপদ্ধতি:** দ্রুত প্রতিকারের জন্য 'ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস' অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করে।
- **UNCRC (১৯৯০) অনুসমর্থন:** অনলাইনে এবং অফলাইনে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুরক্ষাকে উৎসাহিত করে।

শিশুদের সুরক্ষায় বিশ্বজুড়ে নেওয়া পদক্ষেপ

- **অস্ট্রেলিয়া:** ১৬ বছরের কম বয়সীদের ১০টি প্রধান সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (**ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ইউটিউব, স্ন্যাপচ্যাট, এক্স ইত্যাদি**) অ্যাকাউন্ট খোলা নিষিদ্ধ করে আইন পাস করেছে। বয়স যাচাইকরণ এবং ৫০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার পর্যন্ত জরিমানার মাধ্যমে এটি কার্যকর করা হচ্ছে।
- **জার্মানি এবং ফ্রান্স:** অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অভিভাবকদের সম্মতির বয়সসীমা বাড়িয়েছে।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** 'কিডস অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট' গোপনীয়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করে।
- **যুক্তরাজ্য:** 'অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট, ২০২৩' ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য কঠোর মানদণ্ড এবং উপযুক্ত বয়সসীমা নির্ধারণ করেছে।
- **নেদারল্যান্ডস এবং দক্ষিণ কোরিয়া:** শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা সীমিত করেছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

- **শিশু-কেন্দ্রিক ডিজিটাল শাসন কাঠামো:** রাষ্ট্র, প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম এবং নাগরিক সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বয়স-উপযোগী ডিজাইন, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা (Privacy-by-default) এবং অ্যালগরিদমের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের 'Age-Appropriate Design Code' থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে।
- **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ:** চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮-এর পরিধি বাড়ানো, সাইবার নোডাল অফিসারদের প্রশিক্ষণ এবং অনলাইন নির্যাতনের দ্রুত অভিযোগ জানাতে 'POCSO e-Box'-এর মতো ডিজিটাল প্যানিক বোতামের ব্যবহার আরও জনপ্রিয় করতে হবে।
- **ডিজিটাল দক্ষতা ও শিক্ষার প্রসার:** স্কুল পর্যায় থেকে ডিজিটাল সাক্ষরতা, অনলাইনে দায়িত্বশীল আচরণ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। স্ক্রিন আসক্তি কাটাতে কেরালার 'ডিজিটাল ডি-অ্যাডিকশন (D-DAD)' কেন্দ্রের মতো মডেল সারা দেশে অনুসরণ করা যেতে পারে।
- **সচেতনতামূলক অভিযান:** 'নিপুণ ভারত' (NIPUN Bharat) এবং 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র মতো সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষকদের অনলাইন ঝুঁকি শনাক্ত ও তা মোকাবিলা করার জন্য সচেতন করতে হবে।
- **অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ:** শিশু ও অভিভাবকের যৌথ অ্যাকাউন্ট পরিচালনা এবং 'গুগল ফ্যামিলি লিঙ্ক'-এর মতো অ্যাপের মাধ্যমে স্ক্রিন-টাইম নিয়ন্ত্রণ ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে উৎসাহ দিতে হবে।
- **প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর দায়বদ্ধতা:** প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহারকারীর সুরক্ষায় বিশেষ আইনি বাধ্যবাধকতার (Duty of care) আওতায় আনতে হবে। আইটি মন্ত্রকের (MeitY) বাইরে একটি স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে তদারকি বাড়াতে হবে (যেমনটা বর্তমানে মেটা-র ১৩+ বয়সসীমা নীতিতে রয়েছে)।

উপসংহার

নিষেধাজ্ঞা কেবল নিয়ন্ত্রণের একটি ভ্রান্ত আশ্বাস দেয়, যা সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বিমুখী সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে ডিজিটাল অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে। প্রকৃত সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে নীতি নির্ধারণ এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করা—যাতে প্রযুক্তি-নির্ভর বিশ্বে শিশুদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবতন্ত্র ভারতের সংবিধানের সেই আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়েই তরুণ সমাজকে শক্তিশালী করতে চায়।

প্রশ্ন: *ভারতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা ও ডিজিটাল অধিকার-এর মধ্যে বিদ্যমান টানাপোড়েন আলোচনা করুন। কীভাবে রাষ্ট্র একটি অধিকারভিত্তিক ও শিশু-কেন্দ্রিক ডিজিটাল শাসন কাঠামো নিশ্চিত করতে পারে? (২৫০ শব্দ)*

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

জেনারেল স্টাডিজ ২

2.1. রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. সংবিধান যখন পবিত্র আঙিনায়: ভারতে ধর্মীয় বিবাদের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি **মাদ্রাজ হাইকোর্ট** দুটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছে। এর একটি হলো **তিরুপারঙ্কুনদ্রম দীপথুন** (Thiruparankundram Deepathoon) সংক্রান্ত বিতর্ক এবং অন্যটি কাঞ্চিপুরম বরদরাজ পেরুমল মন্দিরে **থেনকালাই** (Thenkalai) সম্প্রদায়ের স্তোত্র পাঠের অধিকার বিষয়ক।
- এই রায়গুলি জটিল ধর্মীয় বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে **বিচারবিভাগের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার** ওপর আলোকপাত করে। এই বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে আদালত পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, মন্দিরগুলি কোনও একান্ত **'ব্যক্তিগত স্থান'** নয় যা **সাংবিধানিক নজরদারির** ঊর্ধ্বে থাকতে পারে।
- এই ঘটনাপ্রবাহ ভারতীয় আইনের ক্ষেত্রে এক **সন্ধিক্ষণকে** নির্দেশ করে, যেখানে ধর্মীয় আচার-আচরণকে সুশৃঙ্খলভাবে **সাংবিধানিক নীতিমালার** সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হচ্ছে।

মন্দির-সংক্রান্ত বিবাদ: দেওয়ানি অধিকার থেকে সাংবিধানিক অধিকারে বিবর্তন

ক) প্রাক-সাংবিধানিক যুগ: দেওয়ানি বিবাদ হিসেবে মন্দিরে প্রবেশ

- **দেওয়ানি মামলা কাঠামো:** স্বাধীনতার আগে মন্দিরে প্রবেশ বা উপাসনা সংক্রান্ত বিবাদগুলিকে কেবল ব্যক্তিগত **দেওয়ানি অধিকার** (Civil Rights) হিসেবে দেখা হতো।
- **কামুধি মন্দির প্রবেশ মামলা:** একটি ধ্রুপদী উদাহরণ হলো রামানাথপুরমের কামুধি মন্দিরে নাডার সম্প্রদায়ের প্রবেশের অধিকারের লড়াই, যা শেষ পর্যন্ত লন্ডনের **প্রিভি কাউন্সিল** (Privy Council) পর্যন্ত গড়িয়েছিল।
- **শঙ্করলিঙ্গ নাডান বনাম রাজা রাজেশ্বর দোরাই (১৯০৮):** এই মামলায় প্রিভি কাউন্সিলকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে নাডার সম্প্রদায়ের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে কি না। এটি প্রতিফলিত করে যে তৎকালীন সময়ে এই প্রশ্নগুলি মৌলিক অধিকারের পরিবর্তে কেবল দেওয়ানি অধিকারের মানদণ্ডে বিচার করা হতো।

খ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আইনি হস্তক্ষেপ

- **নিয়ন্ত্রণমূলক মাইলফলক:** ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি সরকার মন্দির ও তাদের এনডাওমেন্ট পরিচালনার জন্য **'মাদ্রাজ হিন্দু রিলিজিয়াস এনডাওমেন্টস অ্যাক্ট'** প্রণয়ন করে।
- **তদারকি ভূমিকা:** এই আইনের ফলে মন্দিরের তহবিলের অডিট এবং স্থানীয় মন্দির কমিটি গঠন সম্ভব হয়, যা মন্দির প্রশাসনে সরকারের **তদারকি ভূমিকার** (Supervisory Role) ভিত্তি স্থাপন করে।

গ) ১৯৫০ পরবর্তী সময়: মৌলিক অধিকারে রূপান্তর

- **সংবিধান গ্রহণ:** ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণের মাধ্যমে **অনুচ্ছেদ ২৫ এবং ২৬** যুক্ত হয়, যা ব্যক্তি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উপাসনার স্বাধীনতা প্রদান করে।
- **জনস্বার্থে সীমাবদ্ধতা:** এই অধিকারগুলিকে জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিকতার অধীন রাখা হয়েছে, যা জনচেতনাকে আঘাত করে এমন ধর্মীয় আচারকে রাষ্ট্রের জন্য **নিয়ন্ত্রণ** করার পথ প্রশস্ত করে।

- **আইনতাত্ত্বিক রূপান্তর:** আদালতগুলি এখন দেওয়ানি অধিকারের গণ্ডি পেরিয়ে সাংবিধানিক নির্দেশিকা, **সাম্য** (Equality) এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলে মন্দির প্রবেশ, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পুরোহিত নিয়োগে সমতার মতো আধুনিক আইনতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে।

ঘ) মন্দির-সংক্রান্ত আইনতত্ত্ব গঠনে রাজ্যগুলির ভূমিকা

- **আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব:** সুশাসনের লক্ষ্যে অনেক রাজ্য **'হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল এনডাওমেন্টস অ্যাক্ট'** প্রণয়ন করেছে।
- **বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা:** এই আইনগুলি বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এর মাধ্যমে রিট আদালতগুলি **(Writ Courts)** খতিয়ে দেখে যে, সরকারি হস্তক্ষেপ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি অন্যদের **সাংবিধানিক অধিকার** সুনিশ্চিত করছে কিনা। এভাবেই গত ৭০ বছরে মন্দির-সংক্রান্ত আইনতত্ত্বের সমৃদ্ধি ঘটেছে।

মূল ধারণা: অপরিহার্য ধর্মীয় আচার (ERP) পরীক্ষা

১. অপরিহার্য ধর্মীয় আচার (Essential Religious Practice) পরীক্ষার প্রকৃতি

- **অপরিহার্যতা তত্ত্ব (Doctrine of Essentiality):** ধর্মীয় বিবাদ সংক্রান্ত আইনতত্ত্বের বিবর্তনে আদালতগুলি খতিয়ে দেখে যে, কোনও ধর্মীয় আচার সাংবিধানিক নীতির সাথে বিরোধিতা করছে কিনা। বিশেষ করে যেখানে মন্দিরে প্রবেশে বাধা বা এমন কোনও প্রথা থাকে যা মৌলিক অধিকার খর্ব করে, সেখানে সাংবিধানিক আদালতগুলি হস্তক্ষেপ করে।
- **ERP পরীক্ষা:** সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক উদ্ভাবিত এই পরীক্ষাটি যাচাই করে যে, কোনও নির্দিষ্ট প্রথা বা আচার ধর্মের জন্য **অপরিহার্য বা অবিচ্ছেদ্য** কিনা। যদি তা অপরিহার্য না হয়, তবে সেই প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক আদর্শের অধীনে বিচার করা হয়।
- **ধর্মনিরপেক্ষ বনাম পবিত্র (Secular vs. Sacred):** যে আচারগুলো ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয়, সেগুলোকে **"ধর্মনিরপেক্ষ"** (Secular) হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিচারবিভাগীয় নির্দেশনার আওতায় আনা হয়। অন্যদিকে, "অপরিহার্য" আচারগুলো বেশি সুরক্ষা পায়, তবে তাও নিরঙ্কুশ (Absolute) নয়।

২. সমালোচনা এবং এই পরীক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার

- **বিচারবিভাগীয় সমালোচনা:** ERP পরীক্ষাটি অনেক সময় **অসংলগ্ন ব্যাখ্যার** (Inconsistent Interpretation) সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন বিচারপতির বেঞ্চ "অপরিহার্য" কী, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।
- **বস্তুনিষ্ঠতা:** সমালোচনা সত্ত্বেও, আদালতগুলো এই পরীক্ষাটি চালিয়ে যাচ্ছে কারণ এটি ধর্মের মূল তত্ত্বে মনোনিবেশ করে বিচারে এক ধরণের **বস্তুনিষ্ঠতা** (Objectivity) প্রদান করে।
- **শবরীমালা রায় এবং তত্ত্বের সংহতি:** ২০১৮ সালের **ইন্ডিয়ান ইয়াং লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম কেরালা রাজ্য** (শবরীমালা মামলা) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এক যুগান্তকারী রায় দেয়। আদালত জানায়, কোনও আচার অপরিহার্য হলেও যদি তা **সাংবিধানিক নৈতিকতার** (Constitutional Morality) পরিপন্থী হয়, তবে তাকে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বাইরে রাখা যাবে না।
- **সাংবিধানিক নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্ব:** এখন এটি দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা সবসময় ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে গঠিত **সাংবিধানিক নৈতিকতার** অধীন।

সাম্প্রতিক মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়

১. **তিরুপারঙ্কুনদ্রম দীপথুন রায়:** আদালত পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত পাথরের স্তম্ভে কার্তিকাই দীপম জ্বালানোর অনুমতি দিয়েছে এবং এটিকে মন্দিরের আচারিক কাঠামোর অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, ঐতিহ্য ও সাংবিধানিক আইনের সংযোগস্থলে আদালত ধর্মীয় আচারকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

২. **কাঞ্চিপুরম বরদরাজ পেরুমল মন্দির বিবাদ:** স্তোত্র পাঠ নিয়ে **থেনকালাই** এবং **ভাদাকালাই** সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিবাদ আদালত নিষ্পত্তি করেছে। ১৯১৫ এবং ১৯৬৯ সালের পুরনো আদেশ এবং ২০০ বছরের পুরনো প্রথার ওপর ভিত্তি করে আদালত থেনকালাই সম্প্রদায়ের **একচেটিয়া অধিকার** (Exclusive Right) বহাল রেখেছে, যা সাম্প্রদায়িক স্বায়ত্তশাসন এবং বৈষম্যহীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের সাংবিধানিকীকরণে বিচারবিভাগের ভূমিকার তাৎপর্য

ধর্মীয় বিবাদগুলো যখন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছায়, তখন তা ভারতীয় আইনতত্ত্বে এক রূপান্তরমূলক অধ্যায়ের সূচনা করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে আনার ফলে তাদের **নিরঙ্কুশ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের** ধারণাটি সীমাবদ্ধ হয়েছে।

- **সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি:** যখন ধর্মীয় বিবাদ আদালতে আসে, তখন আদালত **অনুচ্ছেদ ১৪ (সাম্য), ১৫ (বৈষম্যহীনতা), ২১ (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা), ২৫ (ধর্মীয় স্বাধীনতা)** এবং **২৬ (সাম্প্রদায়িক অধিকার)**-এর নিরিখে বিশ্বাস ও মৌলিক অধিকারের সংযোগস্থল পরীক্ষা করার ক্ষমতা পুনরায় নিশ্চিত করে।
- **পাবলিক ল ফ্রেমওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হওয়া:** মন্দিরগুলি কেবল ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্থান— এই যুক্তিটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় এনডাওমেন্ট আইনের অধীনে পরিচালিত হওয়ায় এগুলোর প্রশাসন এখন **পাবলিক ল** (Public Law)-এর আওতাভুক্ত এবং বৈধ বিচারবিভাগীয় তদারকির যোগ্য।
- **ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** ঘনঘন মামলা মোকদ্দমার ফলে ধর্ম সংক্রান্ত আইনগুলো এখন সাংবিধানিক আলোচনার কেন্দ্রে। আদালত এখানে একটি কাঠামোবদ্ধ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে, যা ধর্মীয় প্রথা এবং **ব্যক্তিগত মর্যাদার** মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন করে।
- **সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনের সমন্বয়:** বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপের লক্ষ্য হলো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসন এবং **সাংবিধানিক নৈতিকতার** মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, যাতে ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব **আইনের শাসনের** (Rule of Law) অধীন থাকে।
- **ধর্মীয় পরিসরে ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা:** বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে গভীরমূল প্রথাগুলোকে পরীক্ষা করা হয় যাতে উপাসকদের অধিকার সাম্য বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী না হয়।
- **রাষ্ট্র-ধর্ম-নাগরিক সম্পর্কের পুনর্গঠন:** ধারাবাহিক সাংবিধানিক নজরদারি রাষ্ট্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ককে নতুন রূপ দিয়েছে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ বজায় রেখেই বিশ্বাসের শাসনকে সংবিধানের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত করেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের সাংবিধানিকীকরণে বিচারবিভাগীয় চ্যালেঞ্জ

ধর্মের "সাংবিধানিকীকরণ"-এর পেছনে প্রগতিশীল উদ্দেশ্য থাকলেও, পবিত্র আধ্যাত্মিক পরিসরে প্রবেশের সময় বিচারবিভাগকে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়:

- **বিচারবিভাগীয় অতিসক্রিয়তা (Judicial Overreach) ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাব:** ধর্মীয় আচার ও তত্ত্বের গভীরে ব্যাপক হস্তক্ষেপ অনেক সময় 'জুডিশিয়াল ওভাররিচ'-এর ঝুঁকি তৈরি করে। আদালত এমন সব ক্ষেত্রেও ঢুকে পড়তে পারে যা ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত।
    - তাছাড়া, বিচারকদের অনেক সময় প্রাচীন শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় **ধর্মতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের** (Theological Expertise) অভাব থাকে, যার ফলে আইনিভাবে সঠিক হলেও সিদ্ধান্তগুলো ধর্মীয়ভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়ে।
- **ERP পরীক্ষায় অসংলগ্নতা:** 'অপরিহার্য ধর্মীয় আচার' (ERP) পরীক্ষাটি প্রায়ই বিভিন্ন বিচারপতির বেঞ্চে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়, যা একটি **আইনতাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা** তৈরি করে।

- "**অপরিহার্য**" আচারের সংজ্ঞা নিয়ে এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আইনের **পূর্বাভাসযোগ্যতা (Predictability)** কমিয়ে দেয়, ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে আদালতের সম্ভাব্য রায় বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

- **রাজনৈতিকীকরণের ঝুঁকি :** উচ্চ-পর্যায়ের ধর্মীয় রায়গুলি প্রায়ই রাজনৈতিক রূপ পায়। বিভিন্ন পক্ষ আদালতের আদেশকে সামাজিক বিভাজন বাড়াতে বা নিজেদের জনসমর্থন জোরালো করতে ব্যবহার করে।

- **নৈতিকতা বনাম স্বায়ত্তশাসনের সংঘাত:** সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং **অনুচ্ছেদ ২৬** দ্বারা প্রদত্ত সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সংস্কারের দাবি জানালে আদালতকে অনেক সময় "**ধর্মনিরপেক্ষ অভিভাবকত্ব**" (Secular Paternalism)-এর অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়, আবার প্রথার পক্ষে সায় দিলে বৈষম্যের সহযোগী হিসেবে দোষারোপ করা হয়।

- **বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের বাধা:** আদালত যুগান্তকারী রায় দিলেও তৃণমূল স্তরে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রতিরোধ, সামাজিক বয়কট বা প্রাতিষ্ঠানিক অসহযোগিতার কারণে বিচারবিভাগীয় আদেশ কার্যকর করা প্রায়ই ব্যহত হয়।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: সাংবিধানিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদারকরণ

১. **বিচারবিভাগের জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা**

- **মানদণ্ডের ধারাবাহিকতা:** পরস্পরবিরোধী রায় এড়াতে আদালতকে **'অপরিহার্য ধর্মীয় আচার' (ERP)** পরীক্ষায় সুনির্দিষ্ট ও সুসংগত মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হবে।
- **অতিসক্রিয়তা পরিহার:** বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ যেন আচারের সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার (Micromanagement) পরিবর্তে কেবল মূল সাংবিধানিক নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকে।
- **তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক বিচার:** রায়গুলোকে বাস্তবসম্মত করতে ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
- **মামলা-পূর্ব মধ্যস্থতা:** সংঘাতমূলক মামলার সংখ্যা কমাতে বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শের মতো বিকল্প ব্যবস্থার অন্বেষণ করা উচিত।
  - **প্রাতিষ্ঠানিক মধ্যস্থতা বৃদ্ধি:** তিরুপারঙ্কুনদ্রম মামলার ন্যায়, যৌথ পবিত্র স্থানের বিবাদ মেটাতে আদালতকে 'শান্তি কমিটি' এবং মধ্যস্থতাকে উৎসাহিত করতে হবে।

২. **আইনসভা ও শাসনবিভাগের ভূমিকা**

- **আইন পর্যালোচনা:** ধর্মীয় এনডাওমেন্ট আইনগুলোকে আধুনিক সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও **আর্থিক দায়বদ্ধতার (Financial Accountability)** নিরিখে সংস্কার করা প্রয়োজন।
- **প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ:** মন্দির পরিচালনা পর্ষদগুলোকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় **সাম্য ও প্রতিনিধিত্ব** নিশ্চিত করতে পারে।
- **নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণ:** রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে ধর্মীয় আচারের নিয়ন্ত্রণ যেন সম্পূর্ণ **নিরপেক্ষ ও বৈষম্যহীন** হয়।

৩. **নাগরিক সমাজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ**

- **সাম্যের অভ্যন্তরীণ চর্চা:** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বৈষম্যহীন নীতি গ্রহণ করতে হবে।
- **সম্প্রদায়গত সংলাপ:** বিভিন্ন উপদলের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মেটানো গেলে সামাজিক **মেরুকরণ (Polarization)** এবং মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস পাবে।
- **সাংবিধানিক সাক্ষরতা:** শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন মানসিকতা তৈরি করতে হবে যা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং **মৌলিক অধিকার**—উভয়কেই যথাযথ সম্মান দিতে শেখাবে।

উপসংহার

ভারতে মন্দির-সংক্রান্ত আইনতত্ত্বের বিবর্তন এটিই প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা কোনও **নিরপেক্ষ বা অবাধ অধিকার** (Absolute Right) নয়; বরং এটি সংবিধানের মূল ভিত্তির সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। 'গর্ভগৃহে' প্রবেশের মাধ্যমে বিচারবিভাগ বিশ্বাসের স্থান দখল করতে চায় না, বরং এটি নিশ্চিত করতে চায় যে বিশ্বাস যেন **ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সাম্যের** কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। বিচারব্যবস্থার চিরস্থায়ী ভূমিকা হলো ধর্মের মূল আধ্যাত্মিক সারমর্মকে সুরক্ষা দেওয়া এবং একইসাথে মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী কুপ্রথাগুলিকে নির্মূল করা।

প্রশ্ন: *'ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়, বরং তা সাংবিধানিক নৈতিকতার অধীন'। সাম্প্রতিক বিচারবিভাগীয় প্রবণতা এবং যুগান্তকারী রায়ের প্রেক্ষিতে এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ধর্মীয় বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সম্প্রীতি জোরদার করার উপায়গুলি প্রস্তাব করুন। (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

3.1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

3.1.1. আসন্ন এআই (AI) বিপ্লব এবং এর বৈশ্বিক প্রভাব

প্রেক্ষাপট

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) একটি রূপান্তরমূলক **'সাধারণ-উদ্দেশ্য প্রযুক্তি'** (General-purpose technology) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, যার প্রভাব **শিল্প বিপ্লব বা ইন্টারনেট বিপ্লবের** সাথে তুলনীয়। বর্তমান এআই-এর এই জোয়ার—যা **জেনারেটিভ এআই, মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং উন্নত সেমিকন্ডাক্টর** ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত—বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শাসন কাঠামো এবং বৈশ্বিক ক্ষমতার সমীকরণকে নতুন করে সাজাচ্ছে। এর প্রভাব কেবল প্রযুক্তির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এক সভ্যতামূলক পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এআই (AI) বিপ্লবের চালিকাশক্তি

১. **দ্রুত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন**

- **লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল** (LLMs) এবং **জেনারেটিভ এআই**-এর বিকাশ, যা যুক্তি প্রদান, কোডিং, বিষয়বস্তু তৈরি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে সক্ষম।
- ক্লাউড কম্পিউটিং, **ইন্টারনেট অফ থিংস** (IoT), রোবোটিক্স এবং ৫জি (5G) নেটওয়ার্কের সাথে এআই-এর সমন্বয়।
- ডেটা স্টোরেজ বা তথ্য সংরক্ষণের খরচ হ্রাস এবং **কম্পিউটেশনাল ক্ষমতা** বৃদ্ধি, যা রিয়েল-টাইম প্রসেসিং বা তাৎক্ষণিক তথ্য বিশ্লেষণকে সম্ভবপর করছে।

২. **বিপুল সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ** (Massive Public and Private Investments)

- বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলোর (আমেরিকা, চীন, ইইউ) কৌশলগত অর্থায়ন, যেখানে এআই-কে **জাতীয় অগ্রাধিকার** হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
- প্রযুক্তি জায়ান্টদের পক্ষ থেকে এআই গবেষণা, চিপ ডিজাইন এবং বৈশ্বিক **ডেটা অবকাঠামো** তৈরিতে বিনিয়োগ।
- প্রতিরক্ষা, নগর পরিকল্পনা, জনকল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান এবং **ডিজিটাল প্রশাসনে** সরকার কর্তৃক এআই-এর ব্যবহার।

তাৎপর্য ও প্রভাব

১. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি**

- **তাৎপর্য:** এআই একটি **সাধারণ-উদ্দেশ্য প্রযুক্তি** হিসেবে বিভিন্ন খাতে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়করণ বা **অটোমেশন** দক্ষতা বাড়ায়, খরচ কমায় এবং ভুলের মাত্রা কমিয়ে আনে। **প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স** বা পূর্বাভাসমূলক বিশ্লেষণ সাপ্লাই চেইন, কৃষি, অর্থায়ন এবং উৎপাদন শিল্পকে শক্তিশালী করে।
- **প্রভাব:** উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি। নতুন ব্যবসায়িক মডেলের (**যেমন:** AI-as-a-Service, **প্ল্যাটফর্ম ইকোনমি**) উত্থান। শিল্পের পুনর্গঠন এবং **ক্রিয়েটিভ ডেসট্রাকশন** (পুরাতন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও নতুনের সৃষ্টি)। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির চাপ।

২. **শ্রমবাজারের রূপান্তর**

- **তাৎপর্য:** রুটিনমাফিক কাজ এবং দাপ্তরিক কাজের অটোমেশন। উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন এআই-সংশ্লিষ্ট চাকরির চাহিদা বৃদ্ধি।

- **প্রভাব:** স্বল্প ও মাঝারি দক্ষতার কর্মক্ষেত্রে সাময়িক **চাকরিচ্যুতি**। দক্ষতা-ভিত্তিক এবং ডিজিটালভাবে মানানসই কর্মসংস্থানের দিকে ঝোঁক। যথাযথ নীতিমালার অভাবে **কাঠামোগত বেকারত্বের** ঝুঁকি।

৩. **ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের ঝুঁকি**

- **তাৎপর্য:** গুটিকতক কর্পোরেশন এবং উন্নত দেশগুলোর হাতে এআই অবকাঠামোর কেন্দ্রীভবন। ডেটা, চিপস এবং কম্পিউটিং ক্ষমতার অসম বণ্টন।
- **প্রভাব:** বৈশ্বিক **ডিজিটাল বিভাজন** (Digital Divide) আরও প্রশস্ত হওয়া। উন্নত দেশগুলোর ওপর উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা। আয়ের মেরুকরণ এবং সম্ভাব্য সামাজিক অস্থিরতা।

৪. **এআই, কৌশলগত আধিপত্য এবং ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব**

- **তাৎপর্য:** প্রতিরক্ষা, নজরদারি এবং সাইবার কার্যক্রমে এআই-কে একটি **কৌশলগত সম্পদ** হিসেবে ব্যবহার। স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে তথ্য ও ডিজিটাল অবকাঠামোর ওপর দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।
- **প্রভাব:** বৈশ্বিক ক্ষমতার লড়াই এবং **টেকনো-ন্যাশনালিজম** বা প্রযুক্তিগত জাতীয়তাবাদের তীব্রতা বৃদ্ধি। **এআই অস্ত্র প্রতিযোগিতার** (AI arms race) ঝুঁকি। বৈশ্বিক ডিজিটাল ব্যবস্থার খণ্ডবিখণ্ড হওয়া। ডেটা এবং সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন নিয়ে বাণিজ্যিক উত্তেজনা।

৫. **সাইবার নিরাপত্তা এবং তথ্য যুদ্ধ**

- **তাৎপর্য:** এআই সাইবার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করলেও এটি উন্নতমানের **সাইবার আক্রমণের** সুযোগ করে দেয়। **ডিপফেক** এবং অপপ্রচারমূলক সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি।
- **প্রভাব:** গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর (Critical Infrastructure) সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচনের ওপর হুমকি। **হাইব্রিড যুদ্ধের** বিস্তার। বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং এআই গভর্ন্যান্স কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা।

এআই শাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতার অভাব**

- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে (যেমন: চালকহীন গাড়ি, এআই দ্বারা রোগ নির্ণয়) **আইনি দায়বদ্ধতা** বা 'লায়াবিলিটি'-র সুস্পষ্ট কাঠামোর অভাব। ডেভেলপার, ব্যবহারকারী নাকি পরিচালনাকারী—কার ওপর দায় বর্তাবে তা নির্ধারণ করা কঠিন।
- এআই-জনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় প্রচলিত আইনি নীতিমালার অপর্যাপ্ততা।

২. **নৈতিক উদ্বেগ: পক্ষপাতিত্ব, গোপনীয়তা এবং নজরদারি**

- অ্যালগরিদমিক **পক্ষপাতিত্বের** কারণে নিয়োগ, ঋণদান, পুলিশিং এবং জনকল্যাণমূলক কাজে বৈষম্যের সৃষ্টি। আদর্শগত অডিটিং এবং স্বচ্ছতার অভাব।
- ফেসিয়াল রিকগনিশন এবং গণ-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে **ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ঝুঁকি**।
- উপাত্ত-চালিত শাসনব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক অধিকারের (গোপনীয়তা, সমতা, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া) মধ্যে দ্বন্দ্ব।

৩. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়** (Societal and Cultural Disruptions)

- এআই-দ্বারা তৈরি কন্টেন্ট নিয়ে **মেধা স্বত্ব** (Intellectual Property) এবং লেখকস্বত্ব সংক্রান্ত বিরোধ।
- কর্মক্ষেত্র, সৃজনশীলতা এবং জ্ঞান উৎপাদনের ধারায় আমূল পরিবর্তন।
- অ্যালগরিদমের সিদ্ধান্তের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা (Human Agency) কমিয়ে দিচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা নষ্ট করছে।

৪. **সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং জনমত** (Social Stability and Public Perception)

- কর্মসংস্থান হারানো এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ভয়। রূপান্তর প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক না হলে **সামাজিক অস্থিরতার** ঝুঁকি।
- অঞ্চল ও প্রজন্মভেদে **ডিজিটাল সাক্ষরতার** বড় ব্যবধান।

৫. **জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা** (National-Level Capacity Constraints)

- সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং উন্নত গবেষণায় সীমাবদ্ধতা। বিদেশি এআই প্ল্যাটফর্ম ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা এবং কার্যকর উপাত্ত সুরক্ষা আইনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা।
- দেশীয় উদ্ভাবন, এআই দক্ষতা বৃদ্ধি (NEP 2020) এবং **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের** (PPP) গুরুত্ব।

ভবিষ্যতের পথ

১. **মানব-কেন্দ্রিক এআই**

- এআই ডিজাইনের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ, মর্যাদা এবং স্বায়ত্তশাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে (স্বাস্থ্যসেবা, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা) মানুষের **তত্ত্বাবধান** (Human Oversight) নিশ্চিত করা।
- জনমনে আস্থা তৈরিতে ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতাকে অন্তর্ভুক্ত করা। মানুষের বিকল্প হিসেবে নয়, বরং মানুষের **সক্ষমতা বৃদ্ধির** হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করা।

২. **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি**

- এআই-চালিত উৎপাদনশীলতা থেকে প্রাপ্ত সুফলকে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুবিধা হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়া। বড় পরিসরে **পুনঃদক্ষতা** (Reskilling) এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগে বিনিয়োগ করা।
- কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকি মোকাবিলায় **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী** শক্তিশালী করা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও উন্নয়নশীল অঞ্চলের দিকে নজর দিয়ে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো।

৩. **ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ**

- ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে একটি **অভিযোজনযোগ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো** (Adaptive Regulatory Framework) গ্রহণ করা।
- অ্যালগরিদমিক স্বচ্ছতা, উপাত্ত সুরক্ষা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- এমন কঠোর নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে চলা যা উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আইনকে প্রযুক্তিগতভাবে প্রাসঙ্গিক রাখতে নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা।

৪. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**

- এআই নৈতিকতা এবং শাসনের বিষয়ে বৈশ্বিক মানদণ্ড তৈরি করা। উপাত্ত শাসন, সাইবার নিরাপত্তা এবং **স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র** নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- জাতিসংঘ (UN), জি-২০ (G20) এবং ওইসিডি (OECD)-র মতো বহুপাক্ষিক ফোরাম ব্যবহার করে নীতি নির্ধারণ করা। নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার বিভাজন এবং **এআই অস্ত্র প্রতিযোগিতা** রোধ করা।

৫. **সক্ষমতা বৃদ্ধি**

- গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা। প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা এবং **স্বনির্ভরতাকে** উৎসাহিত করা।
- উচ্চশিক্ষা এবং শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো। শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে একটি দক্ষ এআই জনবল বা **ট্যালেন্ট পাইপলাইন** তৈরি করা।

উপসংহার

এআই (AI)-এর এই জোয়ার একটি **রূপান্তরমূলক যুগের** সূচনা করেছে, যা একদিকে যেমন অভূতপূর্ব উদ্ভাবন এবং উৎপাদনশীলতার প্রতিশ্রুতি দেয়, অন্যদিকে তেমনি বৈষম্য এবং **ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের** ঝুঁকিও তৈরি করে। এআই যাতে মানবজাতির কল্যাণে অগ্রসর হয়, তা নিশ্চিত করতে এর ভবিষ্যৎ প্রভাব মূলত দূরদর্শী শাসনব্যবস্থা, **বৈশ্বিক সহযোগিতা** এবং **অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালার** ওপর নির্ভর করবে।

প্রশ্ন: *আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতি একই সাথে অভূতপূর্ব সুযোগ এবং জটিল প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। এআই-এর এই আকস্মিক উত্থানের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন। ভারতের বিশেষ প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে এর দায়িত্বশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার উপায়গুলো প্রস্তাব করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.1.2. SHANTI আইন এবং ভারতের পারমাণবিক রূপান্তর

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি ভারতের সংসদ **'সাসটেইনেবল হার্নেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া' (SHANTI)** আইন পাস করেছে, যা পারমাণবিক বিদ্যুৎ খাতে **বেসরকারি সংস্থাগুলোর** অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছে। এই আইনটি ১৯৬২ সালের **'অ্যাটোমিক এনার্জি অ্যাক্ট'** এবং ২০১০ সালের **'সিভিল লায়বিলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট'** (CLNDA)-কে রদ করে একটি নতুন নিয়ন্ত্রক ও দায়বদ্ধতা কাঠামো তৈরি করেছে।
- SHANTI আইনের মূল লক্ষ্য হলো পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে ভারতের যাত্রাকে গতিশীল করা এবং **২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট** পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা। তবে, সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের দায়মুক্তি, ক্ষতিপূরণের আইনি কাঠামোর শিথিলতা এবং জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য **'মোরাল হ্যাজার্ড'** বা **নৈতিক ঝুঁকির** বিষয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সংস্কারের পটভূমি: SHANTI আইনের যৌক্তিকতা

SHANTI আইন ভারতের পারমাণবিক খাতকে একটি বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মডেল থেকে মুক্ত ও **সংকর (hybrid) ইকোসিস্টেমে** রূপান্তরিত করার একটি কাঠামোগত পদক্ষেপ। এই আমূল পরিবর্তনের পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে:

- **জ্বালানি অংশগ্রহণে দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতা:** কয়েক দশক ধরে অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও, ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র **৩%** আসে পারমাণবিক উৎস থেকে। বর্তমানে এই সক্ষমতা মাত্র **৮.৭৮ গিগাওয়াট**, যা জ্বালানি খাতের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে।
- **লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঐতিহাসিক ব্যর্থতা:** এই খাতে বারবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার নজির রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আশির দশকে ২০০০ সালের মধ্যে ১০ গিগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও অর্জিত হয়েছিল মাত্র ২.৮৬ গিগাওয়াট। একইভাবে, ২০০৬ সালে নেওয়া ২০ গিগাওয়াট (২০২০ সালের মধ্যে) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন ছিল মাত্র ৬.৭৮ গিগাওয়াট।
- **পদ্ধতিগত বাধা এবং দীর্ঘসূত্রতা:** উচ্চ মূলধন খরচ, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং প্রকল্পের দীর্ঘ বিলম্ব এই ব্যর্থতার মূল কারণ। কালপক্কমের **প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (PFBR)** এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ; ২০১০ সালে এটি চালু হওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হতে পারেনি।

- **সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা:** এই খাতটি উন্মুক্ত করার ফলে বেসরকারি অংশগ্রহণ বাড়বে, যা সরকারি তহবিলের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দেশীয় ও বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে।
- **উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার:** বেসরকারি খাতের প্রবেশ **স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMR)** এবং আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, দেখা গেছে যে SMR প্রযুক্তি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর একক প্রতি মূলধন খরচ অনেক বেশি হতে পারে।
- **পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে উত্তরণ:** ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **'নেট-জিরো'** বা কার্বনমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এই সংস্কারকে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

SHANTI আইনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতের পারমাণবিক নীতিতে **SHANTI আইন** এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ২০৪৭ সালের মধ্যে **১০০ গিগাওয়াট** পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **কার্বনমুক্ত (Decarbonization)** লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান:** এই আইন পারমাণবিক বিদ্যুতে সরকারের একক নিয়ন্ত্রণ শেষ করেছে। এখন থেকে **বেসরকারি সংস্থা** এবং যৌথ উদ্যোগগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদন, কেন্দ্র পরিচালনা এবং বিশেষ সরঞ্জাম ও জ্বালানি তৈরির কাজ করতে পারবে।
- **কৌশলগত সরকারি নিয়ন্ত্রণ:** ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ, ব্যবহৃত জ্বালানি (spent fuel) ব্যবস্থাপনা এবং থোরিয়াম প্রক্রিয়াকরণের মতো সংবেদনশীল **'ফুয়েল-সাইকেল'** কার্যক্রম শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই সংরক্ষিত থাকবে।
- **শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থা (AERB):** পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে (AERB) **সংবিধিবদ্ধ মর্যাদা (Statutory Status)** দেওয়া হয়েছে। এখন এটি সরাসরি **সংসদের কাছে দায়বদ্ধ**, যা এর স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
- **স্তরভিত্তিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থা:** প্রকল্পের আকার অনুযায়ী পরিচালনাকারীদের (operators) জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে:
  - **বৃহৎ প্রকল্প:** ৩,০০০ কোটি টাকা।
  - **মাঝারি প্রকল্প:** ১,৫০০ কোটি টাকা।
  - **স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMR):** ১০০ কোটি টাকা।
- **নিউক্লিয়ার লায়বিলিটি ফান্ড:** পরিচালনাকারীর সীমার অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ মেটাতে কেন্দ্র সরকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করবে। কোনো একটি দুর্ঘটনার জন্য মোট ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সীমা হবে **৩০০ মিলিয়ন SDR** (প্রায় ৩,৯০০ কোটি টাকা)।
- **সরবরাহকারীদের পূর্ণ দায়মুক্তি:** পূর্ববর্তী CLNDA ২০১০ আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এখন **সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার (Right of Recourse) বাতিল করা হয়েছে।** সরঞ্জামে ত্রুটি থাকলেও সরবরাহকারীরা সব ধরণের দেওয়ানি বা ফৌজদারি দায় থেকে মুক্ত থাকবেন; সমস্ত দায়ভার কেবল পরিচালনাকারীর ওপর বর্তাবে।
- **আইনি একীকরণ:** এই আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা অন্য কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনের আশ্রয় নিয়ে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না। সমস্ত অভিযোগ এই আইনের নির্ধারিত কাঠামোর মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে।
- **অ-বিদ্যুৎ খাতের তদারকি:** বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা (রেডিওথেরাপি), কৃষি এবং শিল্প গবেষণায় **বিকিরণের (Radiation)** শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য একটি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা ও কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।
- **বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা:** দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে **'অ্যাটোমিক এনার্জি রিড্রেসাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল'** এবং একটি বিশেষায়িত **কমিশন** গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ আপিল ট্রাইব্যুনাল (APTEL) এখানে চূড়ান্ত আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবে।
- **আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্য:** ভারতের কোনো দুর্ঘটনায় বিদেশের ক্ষয়ক্ষতিও এই আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে, যা **'কনভেনশন অন সাপ্লিমেন্টারি কমপেনসেশন'** (CSC)-এর মতো আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

SHANTI আইনের গুরুত্ব

SHANTI **আইন** পারমাণবিক জ্বালানি খাতকে একটি উচ্চ-মূল্যের বাণিজ্যিক বাজারে রূপান্তরিত করতে এবং বেসরকারি শিল্পের জন্য বিশাল আর্থিক সুযোগ তৈরি করতে ডিজাইন করা হয়েছে।

- **বিশাল বাজারের সুযোগ:** পারমাণবিক প্রকল্পগুলোতে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই আইন ভারতের বহু-বিলিয়ন ডলারের এই বাজারকে **বেসরকারি সংস্থাগুলোর** জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে।
- **দায়বদ্ধতাহীন মুনাফা:** বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশি সরবরাহকারীরা এখন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বড় কোনো আর্থিক ঝুঁকি বা আইনি মামলার ভয় ছাড়াই বিশাল মুনাফা অর্জন করতে পারবে।
- **বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ:** সরঞ্জাম ত্রুটিপূর্ণ হলেও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার (Right of Recourse) বাতিল করায় বড় ধরণের 'ঝুঁকির বাধা' দূর হয়েছে, যা **সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ** (FDI) বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- **ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ:** এই আইন নিয়ন্ত্রক তদারকি এবং কাজের গতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের **লাভজনকতা** নিশ্চিত করে।

গুরুতর উদ্বেগ: জবাবদিহিতা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি

শিল্পের উন্নয়ন এবং জননিরাপত্তার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এই আইনে কিছু বড় উদ্বেগের জায়গা রয়েছে:

- **ক্ষতিপূরণে বিশাল বৈষম্য:** আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সীমা (প্রায় ৩,৯০০ কোটি টাকা) ঐতিহাসিক দুর্যোগগুলোর ব্যয়ের তুলনায় প্রায় হাজার গুণ কম। যেমন, **ফুকুশিমা** দুর্ঘটনায় ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৬ লক্ষ কোটি টাকা এবং **চেরনোবিল** দুর্ঘটনায় বেলারুশের ক্ষতি হয়েছিল ২১ লক্ষ কোটি টাকা।
- **ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক বোঝা:** আন্তর্জাতিক সহায়তা মিললেও তা মোট ক্ষয়ক্ষতির **১%** পূরণ করতে পারবে কি না সন্দেহ। আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে নাগরিকরা নিজেদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির বোঝা নিজেরাই বইতে বাধ্য হতে পারেন।
- **'মোরাল হ্যাজার্ড' বা নৈতিক ঝুঁকি:** কোম্পানিগুলোকে বিশাল আর্থিক দায় থেকে মুক্তি দেওয়ায় তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রাখার তাগিদ কমে যেতে পারে এবং অধিক মুনাফার জন্য **অতিরিক্ত ঝুঁকি** নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।
- **'অ্যাবসলিউট লায়বিলিটি' বা নিরঙ্কুশ দায়বদ্ধতার শিথিলতা:** "গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের" কারণে ঘটা দুর্ঘটনায় পরিচালনাকারীদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এটি বিপজ্জনক শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিষ্ঠিত আইনি নীতিকে দুর্বল করে, যা শক্তিশালী ও **দুর্যোগ-সহনশীল** কেন্দ্র তৈরির আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে।
- **কর্পোরেট স্বার্থকে অগ্রাধিকার:** এই কাঠামোটি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচালেও দুর্ঘটনার বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি রাষ্ট্র এবং জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়।

পারমাণবিক জ্বালানি প্রসারে অন্যান্য উদ্যোগ

- **জাতীয় পারমাণবিক জ্বালানি মিশন:** ২০২৫-২৬ বাজেটে ২০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এটি শুরু হয়েছে, যার লক্ষ্য ২০৩৩ সালের মধ্যে পাঁচটি দেশীয় SMR (Small Modular Reactor) চালু করা।
- BARC-**এর দেশীয় উদ্ভাবন:** ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার ২০০ মেগাওয়াটের **'ভারত স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর'** (BSMR-200) তৈরি করছে, যা আমদানিনির্ভরতা কমাবে।
- **ত্রি-স্তরীয় বিদ্যুৎ কর্মসূচি:** থোরিয়াম মজুত ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী **জ্বালানি সার্বভৌমত্ব** নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি কৌশলগত পরিকল্পনা।
- **আন্তর্জাতিক পারমাণবিক জোট:** রাশিয়া ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলোর সাথে চুক্তির মাধ্যমে ভারত উন্নত প্রযুক্তি ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: SHANTI কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ

- **নিয়ন্ত্রক সংস্থার স্বাধীনতা বৃদ্ধি:** বাণিজ্যিক গতির চাপে যেন নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য AERB-কে 'অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন'-এর প্রভাবমুক্ত করে পূর্ণ **কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন** প্রদান করতে হবে।
- **ক্ষতিপূরণের সীমা পুনর্বিবেচনা:** নাগরিকদের সুরক্ষার্থে দায়বদ্ধতার সীমা **মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ** করা বা সম্ভাব্য দুর্যোগের মাত্রার সাথে যুক্ত করা উচিত, যাতে বড় কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বাস্তবসম্মত হয়।
- **চুক্তিবদ্ধ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা:** আইনে সরাসরি সুযোগ না থাকলেও, সরঞ্জামের মান বজায় রাখতে পরিচালনাকারীদের উচিত সরবরাহকারীদের সাথে বেসরকারি চুক্তিতে কঠোর **'ইন্ডেমনিটি ক্লজ'** বা ক্ষতিপূরণের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।
- **দেশীয় গবেষণা ও উন্নয়নে জোর:** উচ্চমূল্যের বিদেশি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারতের বিশাল থোরিয়াম মজুত ব্যবহার করে **'ত্রি-স্তরীয় পারমাণবিক কর্মসূচি'** ত্বরান্বিত করতে হবে, যা দীর্ঘমেয়াদী **জ্বালানি সার্বভৌমত্ব** নিশ্চিত করবে।
- **জনসচেতনতা ও স্বচ্ছতা:** পারমাণবিক নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ দূর করতে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা প্রোটোকল সম্পর্কে **জনগণের আস্থা** বৃদ্ধি করবে।

উপসংহার

SHANTI **আইন** ভারতের পারমাণবিক খাতকে উন্মুক্ত করতে এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **'নেট জিরো'** লক্ষ্য অর্জনে একটি সাহসী পদক্ষেপ। তবে, সরবরাহকারীদের দায়মুক্তি এবং ক্ষতিপূরণের সীমিত সীমা জননিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। এই আইনের সাফল্য নির্ভর করবে 'Ease of Doing Business' বা ব্যবসা সহজীকরণের সাথে কঠোর নিরাপত্তা মানদণ্ড এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার সঠিক ভারসাম্য রক্ষার ওপর।

প্রশ্ন: *SHANTI আইনের লক্ষ্য হলো ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করা। এই সংস্কার বাণিজ্যিক কার্যকারিতার সাথে জননিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছে কি না—তা সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.2. অর্থনীতি

3.2.1. সংশোধিত শ্রমবিধি: মজুরি কাঠামোর সংস্কার ও শ্রমিক সশক্তিকরণ

প্রেক্ষাপট

- ভারতে **চারটি শ্রমবিধির** বাস্তবায়ন মূলত ঔপনিবেশিক আমলের বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে একটি সুসংহত ও প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবস্থার দিকে আমূল পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

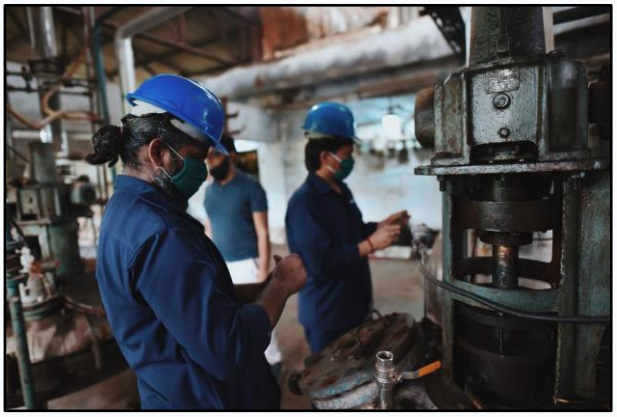

- **২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে** একত্রিত করার মাধ্যমে এই সংস্কারের লক্ষ্য হলো— **'সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ'** (Ease of Doing Business) নিশ্চিত করার পাশাপাশি **'সামাজিক নিরাপত্তার সার্বজনীনকরণ'**-এর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা।
- এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে এমন এক **কাঠামোগত হস্তক্ষেপ,** যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সমানভাবে পৌঁছে দিতে ডিজাইন করা হয়েছে।

পটভূমি: শ্রমবিধি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ঐতিহাসিকভাবে ভারতের শ্রমবাজার অসংখ্য জটিল ও ওভারল্যাপিং আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। এর ফলে একদিকে যেমন নিয়োগকর্তাদের ওপর আইনি পালনের বোঝা বাড়ত, অন্যদিকে দেশের প্রায় **৯০% অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক** কোনো প্রথাগত সুরক্ষা ছাড়াই থেকে যেতেন। এই সমস্যাগুলি সমাধানে **দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশন (২০০২)** আইনগুলিকে একত্রিত করার সুপারিশ করেছিল, যাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মোকাবিলা করা যায়:

- **পদ্ধতিগত জটিলতা:** ৪০টির বেশি কেন্দ্রীয় এবং ১০০টিরও বেশি রাজ্য আইন এক অদক্ষ **'ইন্সপেক্টর রাজ'** তৈরি করেছিল।
- **আইনি বিচ্ছিন্নতা: 'মজুরি', 'শ্রমিক'** বা **'কারখানা'**—এই শব্দগুলোর সংজ্ঞায় ধারাবাহিকতা না থাকায় অন্তহীন আইনি বিবাদ লেগেই থাকত।
- **আধুনিক যুগের বর্জন:** দ্রুত বাড়তে থাকা **'গিগ' (Gig) ও 'প্ল্যাটফর্ম' অর্থনীতির** কর্মীদের জন্য আইনি স্বীকৃতির সম্পূর্ণ অভাব ছিল।

শ্রমবিধির প্রধান বিধান: মজুরির পুনর্মূল্যায়ন ও শ্রমিক সশক্তিকরণ

এই সংস্কার মূলত চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: **মজুরি বিধি (২০১৯), শিল্প সম্পর্ক বিধি (২০২০), সামাজিক নিরাপত্তা বিধি (২০২০)** এবং **পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিধি (২০২০)**।

১. **মজুরির অভিন্ন সংজ্ঞা**

- **মজুরি বিধি, ২০১৯**-এ 'মজুরি'র একটি একক ও সার্বজনীন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যা চারটি শ্রমবিধির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটি আগের বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষেত্র-ভিত্তিক সংজ্ঞাগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।
- আগের ব্যবস্থায়, **১৯৩৬ সালের মজুরি প্রদান আইন, ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৭২ সালের গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন** এবং **১৯৫২ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের** মতো বিভিন্ন সংবিধিতে মজুরির সংজ্ঞা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই সংজ্ঞাগুলিতে প্রায়ই বিভিন্ন ভাতাকে বাদ দেওয়া হতো, যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তার হিসেব করার সময় মূল মজুরির ভিত্তি কমে যেত।
- বর্তমানে, মজুরির মধ্যে স্পষ্টতই **বেসিক পে (Basic Pay)**, মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance) এবং **রিটেইনিং অ্যালাওয়েন্স** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA), যাতায়াত ভাতা, পিএফ/এনপিএস-এ নিয়োগকর্তার অবদান এবং সংবিধিবদ্ধ বোনাসকে নির্দিষ্ট সীমা সাপেক্ষে বহির্ভূত রাখা হয়েছে।
- এখানে একটি **'৫০% নিয়ম'** যুক্ত করা হয়েছে: মোট পারিশ্রমিকের অন্তত ৫০% অবশ্যই 'মজুরি' হতে হবে। যদি ভাতা ৫০% অতিক্রম করে, তবে অতিরিক্ত অংশটি মজুরির সাথে যোগ করা হবে। এতে সামাজিক নিরাপত্তায় শ্রমিকের অবদানের পরিমাণ বাড়বে।

২. **সার্বজনীন ন্যূনতম মজুরি ও সময়মতো অর্থপ্রদান**

- এই বিধিতে একটি **ফ্লোর ওয়েজ (Floor Wage)** বা ভিত্তি মজুরির কথা বলা হয়েছে (ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্র সরকার এটি নির্ধারণ করবে, যার নিচে কোনো রাজ্য সরকার মজুরি ধার্য করতে পারবে না)। এর পাশাপাশি **সংবিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি** বা স্ট্যাটুটরি মিনিমাম ওয়েজ নিশ্চিত করা হয়েছে যা স্থায়ী, নির্দিষ্ট মেয়াদী, চুক্তিভিত্তিক এবং গিগ শ্রমিকসহ সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে।
- এটি মজুরি থেকে যথেচ্ছ কর্তন নিষিদ্ধ করে, সময়মতো মজুরি প্রদান (মূলত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে) নিশ্চিত করে এবং আয়ের সুরক্ষা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সাহায্য করে।

৩. **গ্র্যাচুইটি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসংস্থান**

- সংশোধিত গ্র্যাচুইটি বিধান অনুযায়ী, **নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মীরা** এক বছরের নিরবিচ্ছিন্ন কাজ শেষ করলেই গ্র্যাচুইটির যোগ্য হবেন। আগে ১৯৭২ সালের আইন অনুযায়ী এটি ছিল পাঁচ বছর।
- এই পরিবর্তনটি বর্তমানে বৃদ্ধি পাওয়া স্বল্পমেয়াদী বা প্রজেক্ট-ভিত্তিক কাজের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং অস্থায়ী কাজকেও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সুবিধা ও সম্পদ তৈরির একটি মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলে।

৪. **গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি**

- **সামাজিক নিরাপত্তা বিধি** প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে **গিগ (Gig)** এবং **প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের** স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প, বিমা ও কল্যাণ তহবিলের আওতায় এনেছে। আগে এই বিশাল অংশের শ্রমিকরা আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল।
- এটি রাজ্য বা নিয়োগকর্তা নির্বিশেষে প্রাপ্ত সুবিধার **বহনযোগ্যতা (Portability)** নিশ্চিত করে, যা পরিযায়ী এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে কর্মস্থল বা চাকরি পরিবর্তন করলেও তাদের সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাগুলি নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

শ্রম সংস্কারের তাৎপর্য: আধুনিক শ্রমিকদের সশক্তিকরণ

শ্রম আইনগুলোকে চারটি সংহিতায় একত্রিত করা কেবল একটি প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার ও আর্থিক মর্যাদার সমন্বয় ঘটানোর একটি কাঠামোগত পদক্ষেপ।

- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা:** মোট পারিশ্রমিকের মধ্যে মজুরির অংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পিএফ (PF), পেনশন ও গ্র্যাচুইটিতে নিয়োগকর্তার অবদান বাড়বে। ফলে শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় ও অবসরকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
  - এছাড়া, নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মীদের জন্য এক বছর পরেই **গ্র্যাচুইটি** পাওয়ার সুবিধা কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা কমাবে।
- **অসংগঠিত ও গিগ কাজের আনুষ্ঠানিকীকরণ:** গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনায় অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ প্রথাগত কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া, সুবিধার **বহনযোগ্যতা (Portability)** পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।
- **আয় পুনর্বণ্টন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি:** শ্রমিকদের হাতে বেশি অর্থ পৌঁছালে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। শ্রমিকের আয় মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেই সঞ্চালিত হয়, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
- **সরলীকরণ ও স্বচ্ছতা:** ২৯টি আইনকে ৪টি কোডে রূপান্তর করায় আইনি জটিলতা কমবে। **সিঙ্গল রেজিস্ট্রেশন** ও ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আসবে এবং 'ইন্সপেক্টর রাজ'-এর দাপট কমবে।

বহুমুখী প্রভাব: শ্রমিক, নিয়োগকর্তা ও অর্থনীতি

- **শ্রমিকদের ওপর প্রভাব:** উচ্চতর মজুরি কাঠামো ও গ্র্যাচুইটি সুবিধার ফলে বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের আয়ের সুরক্ষা বাড়বে। এটি গিগ শ্রমিকদের শোষণ থেকে রক্ষা করবে এবং একটি মজবুত **সামাজিক সুরক্ষা কবচ** তৈরি করবে।
- **নিয়োগকর্তাদের ওপর প্রভাব:** ৫০% মজুরির নিয়ম এবং বর্ধিত গ্র্যাচুইটির ফলে বড় সংস্থাগুলোর (যেমন: আইটি বা নির্মাণ শিল্প) সংবিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতা ও খরচ কিছুটা বাড়বে। তবে ডিজিটাল ও সহজতর কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা এই বাড়তি খরচের বিপরীতে ব্যবসার পরিবেশকে আরও সহজ ও পূর্বাভাসযোগ্য করে তুলবে।
- **সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব:** শ্রমিকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়লে দেশের সঞ্চয়ের ভিত্তি মজবুত হয়। এটি শ্রমবাজারের বিভাজন দূর করে এবং অর্থনৈতিক সংকটের সময় শ্রমিকদের টিকে থাকার ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে **সর্বজনীন** হয়ে ওঠে।

নতুন শ্রমবিধির প্রধান সীমাবদ্ধতা

বিপ্লবী সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কিছু কাঠামোগত ও পরিচালনাগত বাধা শ্রমিক সশক্তিকরণের লক্ষ্যকে ব্যাহত করতে পারে:

১. **বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের বাধা**

- **অসম গ্রহণ:** কেন্দ্র বিজ্ঞপ্তি দিলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর প্রয়োগে সামঞ্জস্য নেই।

- **তদারকির অভাব:** তৃণমূল স্তরে সচেতনতার অভাব এবং 'ইন্সপেক্টর'-এর বদলে 'ইন্সপেক্টর-কাম-ফ্যাসিলিটেটর' নিয়োগের ফলে নিয়ম লঙ্ঘন হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

২. **সংজ্ঞার অস্পষ্টতা ও আইনি জটিলতা**

- 'মোট পারিশ্রমিক'-এর স্পষ্ট সংজ্ঞার অভাবে **৫০% মজুরি নিয়ম** কার্যকর করা জটিল হয়ে পড়ছে, যা ভবিষ্যতে আইনি বিবাদ বাড়াতে পারে।

৩. **শ্রমিক ইউনিয়নের বিরোধিতা**

- ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 'ভারত বনধ'-এর মতো কর্মসূচিগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, ইউনিয়নগুলো এই বিধিকে কর্পোরেট-বান্ধব বলে মনে করছে। ধর্মঘটের ওপর কড়াকড়িকে **যৌথ দরকষাকষির** (Collective Bargaining) অধিকার খর্ব করা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৪. **পরিধি ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ**

- **গিগ শ্রমিকদের** অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, অন্তত ৯০ দিন কাজের শর্ত অনেককেই সুবিধার বাইরে রাখছে। এছাড়া ছাঁটাইয়ের **অনুমতির সীমা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ জন** করায় ছোট সংস্থার কর্মীরা আরও বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন।
- **ডিজিটাল বিভাজন:** ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধনের জন্য আধার-সংযুক্ত নথির প্রয়োজন অনেক প্রান্তিক ও পরিযায়ী শ্রমিককে বঞ্চিত করছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে

শ্রমবিধিকে সফল করতে নিম্নোক্ত বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন:

- **যুক্তরাষ্ট্রীয় সমন্বয়:** যেহেতু 'শ্রম' একটি যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়, তাই প্রতিটি রাজ্য সরকারকে দ্রুত বিধিগুলো কার্যকর করতে হবে যাতে সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য না থাকে।
- **ডিজিটাল পরিকাঠামোর (DPI) ব্যবহার:** ই-শ্রম এবং EPFO পোর্টালকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। শ্রমিকদের ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়িয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা জরুরি।
- **পুনঃদক্ষতা বৃদ্ধি (Re-skilling):** অটোমেশন ও গিগ অর্থনীতির অস্থিরতা মোকাবিলায় একটি **জাতীয় পুনঃদক্ষতা তহবিল** গঠন করা প্রয়োজন, যাতে কাজ পরিবর্তনের সময় শ্রমিকের আয় বন্ধ না হয়।
- **MSME-দের জন্য সহায়তা:** ক্ষুদ্র শিল্পগুলো যাতে বাড়তি আর্থিক বোঝা সামলাতে পারে, সেজন্য সরকারকে সাময়িক ভর্তুকি বা কর ছাড়ের কথা ভাবতে হবে।
- **ত্রিপক্ষীয় সংলাপ:** সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে আস্থার সংকট দূর করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের শ্রমবিধিগুলো কেবল আইনি সংস্কার নয়; বরং এগুলো একবিংশ শতাব্দীর একটি **সামাজিক চুক্তি**। আয় সুরক্ষা এবং শ্রমের মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সংস্কারগুলি ভারতীয় শ্রমিককে নিছক **'পরিবর্তনশীল খরচ'** (Variable Cost) থেকে এক **'মূল্যবান অংশীদার'** (Valued Stakeholder)-এ উন্নীত করেছে। এই কাঠামোর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নির্ভর করবে এর কার্যকর প্রয়োগের ওপর, যাতে ভারতের উন্নয়নের সুফল প্রতিটি প্রান্তিক শ্রমিকের কাছে পৌঁছাতে পারে।

প্রশ্ন: *ভারতের শ্রমবাজার সংস্কারের প্রেক্ষাপটে চারটি 'শ্রমবিধি'-র (Labour Codes) গুণাগুণ আলোচনা করুন। এই বিষয়ে বর্তমান অগ্রগতি কতদূর? ২৫০ শব্দ*

***

জেনারেল স্টাডিজ ৪

4.1. নীতিশাস্ত্র

4.1.1. খননযোগ্য সত্তা – পরবর্তী বড় পণ্য হিসেবে মানবজীবন

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের একটি ধারণাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। মিডিয়া, প্রযুক্তি, অর্থায়ন, পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইকোসিস্টেমের মধ্য দিয়ে কীভাবে মানুষের নিজস্ব সত্তা, ব্যক্তিগত গল্প এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে একটি নতুন বৈশ্বিক পণ্যে রূপান্তরিত করা হচ্ছে—এই বিশ্লেষণে তা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

শিল্প পুঁজিবাদ থেকে সামাজিকতা নিষ্কাশনের বিবর্তন

ঐতিহ্যবাহী শিল্প পুঁজিবাদ থেকে সমসাময়িক যুগে উত্তরণের এই পথটি মূল্য আহরণ বা শোষণের কেন্দ্রবিন্দুতে এক আমূল পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে।

- **মার্কসীয় উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব (Marxist Surplus Value Theory):** শিল্প পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তৈরি এবং তার শোষণ। কার্ল মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী, উদ্বৃত্ত মূল্য হলো শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের অতিরিক্ত যে মূল্য উৎপাদিত হয়, যা পুঁজির মালিক ও ব্যবস্থাপকদের পকেটে 'মুনাফা' নামক এক রহস্যময় রূপে জমা হয়।
- **নিষ্কাশনের নতুন দিগন্ত:** আজ মানুষ নিজেই পুঁজিবাদের নিষ্কাশন বা শোষণের নতুন লক্ষ্যবস্তু ও দিগন্ত হয়ে উঠেছে। এই নতুন লক্ষ্যবস্তু হলো মানুষের **'সামাজিকতা'** (Sociality)। অর্থাৎ, শোষণের কেন্দ্রবিন্দু এখন আর শারীরিক শ্রম নয়, বরং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল নির্যাস।
- **সামাজিক বন্ধনের সর্বব্যাপী শোষণ:** খনির মতো খুঁড়ে বের করার এই নতুন প্রক্রিয়াটি মানুষের সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রকে লক্ষ্যবস্তু করে—তা সে বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক বন্ধন, সহপাঠী, সন্তান, সহকর্মী বা প্রতিবেশীই হোক না কেন।
- **কার্যকরী এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্ক:** এই শোষণ প্রক্রিয়া আমাদের ডিজিটাল জীবন, রাজনৈতিক মিত্র, এমনকি খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহকারীদের পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে মানুষের সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডই আজ মুনাফার সম্পদে পরিণত হয়েছে।
- **সামাজিক সুরক্ষা কবচের 'সৃজনশীল ধ্বংস' (Creative Destruction):** এই প্রক্রিয়াটি **'সৃজনশীল ধ্বংসের'** এক নতুন পর্যায়কে উপস্থাপন করে, যেখানে **গোপনীয়তা, অন্তরঙ্গতা এবং বিশ্বাসের** মতো সনাতন ধারণাগুলোকে সেকেলে বা অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই—কোনো অনুমতি বা সীমারেখা ছাড়াই মানুষের জীবন থেকে অবাধে তথ্য ও মূল্য নিষ্কাশন করা।

খননযোগ্য সত্তা এবং এর প্রধান চালিকাশক্তি

'খননযোগ্য সত্তা' বলতে বোঝায় মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব বা সত্তাকে একটি **পণ্য** হিসেবে বিবেচনা করা, যাকে গল্প, সামাজিকতা এবং ডিজিটাল পরিচয়ের মাধ্যমে **খনন, প্যাকেজজাত এবং অর্থোপকরণে** (Monetise) রূপান্তর করা সম্ভব। মানুষের সত্তাকে কাঁচামালের এই নতুন রূপে রূপান্তরিত করার পেছনে বিশ্ববাজারের তিনটি মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন কাজ করছে:

১. **বহনযোগ্যতা এবং চরিত্রের বৈশ্বিক সন্ধান**

বিশ্ববাজারের আকর্ষণ এখন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাজারকে দখল করে নিয়েছে। এর ফলে **মেক্সিকো থেকে নেপাল কিংবা স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া**—সর্বত্রই নতুন নতুন গল্পের এক বৈশ্বিক সন্ধান চলছে।

- **স্থানীয় লোকগাথা ও পুরাণের বাণিজ্যিকীকরণ:** প্রকাশনা সংস্থা এবং পুরস্কার কমিটিগুলো এখন স্থানীয় পৌরাণিক কাহিনী বা লোকগাথাগুলো খুঁটিয়ে দেখছে। তাদের লক্ষ্য এমন কিছু খুঁজে বের করা যা সব দেশেই গ্রহণযোগ্য (Portability) এবং যার মধ্যে কিছু **'অস্পষ্ট সার্বজনীন আবেদন'** রয়েছে।
- **নতুন ধরনের চরিত্রের চাহিদা:** বিশ্ববাজারের ক্ষুধা মেটাতে এখন এলিয়েন, সাইবার-মনস্টার কিংবা পোস্ট-ব্লবসের মতো নতুন ও বৈচিত্র্যময় চরিত্র খোঁজা হচ্ছে।

২. **'আঞ্চলিকতা' বা লোকালিটির পুনঃসংজ্ঞা**

আঞ্চলিকতা এখন আর কেবল কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা নিকটবর্তী পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি এখন **বৈশ্বিক সমস্যাবলীর একটি প্রতিফলক** (Prismatic refraction) হিসেবে কাজ করে।

- **ন্যারেটিভ ফার্স্ট রেসপন্ডার্স (Narrative First Responders):** যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যামেরা হাতে থাকা সাধারণ মানুষ যখন ছবি তোলেন, তারা মূলত ফটোসাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন এবং বিশ্বজুড়ে আলোচনার নতুন খোরাক জোগাতে সাহায্য করেন।
- **সিন্ডিকেটেড সংবাদ পরিষেবা:** বিভিন্ন বৈশ্বিক সংবাদ সংস্থা স্থানীয় ঘটনাগুলোকে বাছাই (Triage) করে বিশ্ব মিডিয়ার চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে সরবরাহ করে। এর ফলে এমন এক নতুন ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরি হচ্ছে যা স্থানীয় ও বৈশ্বিকের মধ্যকার চিরাচরিত পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দেয়।

৩. **'আমি' এবং 'আমার' বহুধা বিস্তৃতি (Multiplication of the "I" and the "Me")**

নিজের একটি 'গল্প' থাকার অধিকার এখন আর কেবল ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এই অধিকার এখন সাধারণ মানুষ ছাড়িয়ে ব্যাংক, রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কাছেও পৌঁছে গেছে।

- **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধূসর এলাকা:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সন্ধিক্ষণে **সিরি (Siri) বা চ্যাটজিপিটি (ChatGPT)**-র মতো বটগুলো মানুষের মতো আবেগ এবং দুর্বলতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এটি আবেগ, বিচারবুদ্ধি এবং সহজাত অনুভূতির (Intuition) ওপর মানুষের যে একক আধিপত্য ছিল, তাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

গল্পকথনের মহান শৃঙ্খল

নিজস্ব সত্তার এই 'খনন' প্রক্রিয়াটি একটি সুশৃঙ্খল বর্ণনা এবং দর্শক সংগ্রহের মাধ্যমে সচল রাখা হয়:

- **গল্পের অধিকার:** প্রতিটি ব্যক্তিকে **বীরত্ব, শিকার** (Victimhood) বা **মুক্তির গল্প** তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়। **ইনফ্লুয়েন্সার, কোচ এবং বিভিন্ন রাইটিং অ্যাপের** মাধ্যমে এই গল্পগুলোকে বাজারের উপযোগী করে তোলার জন্য পেশাদার সহায়তা প্রদান করা হয়।
- **ভাইরাল হওয়ার বাণিজ্যিকীকরণ:** তুচ্ছ ব্যক্তিগত গল্পের আকস্মিক 'ভাইরাল' হওয়ার ঘটনা অসংখ্য ইউটিউব তারকার ক্যারিয়ার তৈরি করে দিয়েছে।
- **স্লোগানের মেলবন্ধন:** বর্তমান বাজার দুটি বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে চলে—প্রথমত, প্রতিটি সত্তার একটি গল্প আছে; দ্বিতীয়ত, প্রতিটি গল্প একজন দর্শক পাওয়ার যোগ্য। এর ফলে ডেটা সংগ্রহের জন্য প্রতিটি জীবন্ত মানুষের অস্তিত্বকে খনির মতো খুঁড়ে দেখা হচ্ছে।

প্রযুক্তিগত অনুঘটক: ওটিটি (OTT) স্ট্রিমিং এবং বিনির্মাণ

গল্পের বাজারে ওটিটি স্ট্রিমিং (নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, ডিজনি) বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

- **অবকাঠামোগত বিপ্লব:** ওটিটি প্রযুক্তি পুরোপুরি ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল। এটি বড় স্টুডিওগুলোর আগের বাজার দখল করেছে এবং প্রচলিত ডিস্ট্রিবিউশন মডেলগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছে।

- **সাধারণের উত্থান:** গল্পের অর্থনীতি এখন 'অচেনা' বা সাধারণ মানের অভিনেতাদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে যারা অসামান্যভাবে সাধারণ। এটি নিজের সত্তার এক ধরণের গণতন্ত্রীকরণকে তুলে ধরে, যদিও এই বিষয়টি পুরোপুরি ইতিবাচক নয়।
- **অস্থির সমন্বয়:** চিরাচরিত ব্যক্তির ধারণা এখন **ক্রেডিট স্কোর**, বিমা তালিকা, অ্যালগরিদমিক ডেটাবেস এবং ভোক্তা প্রোফাইলের এক অস্থির সমন্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখন আর একজন একক বা অবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন পড়ে না।
- **সেলফির উৎস: চার্লস টেলরের** বিখ্যাত **'সোর্সেস অব দ্য সেলফ'** (নিজের সত্তার উৎস) থেকে এখন আমরা **'সোর্সেস অব দ্য সেলফি'**-তে স্থানান্তরিত হয়েছি। এখানে তারকার পাশে **সেলফি তোলা বা ফটোবোম্বিং** করাকে **লেন্স-ভিত্তিক সমতার** মাধ্যমে গণতন্ত্রীকরণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

কেস স্টাডি: ভারতের স্ট্রিমিং বাজার

২০১৮ সালে **নেটফ্লিক্সের সিইও রিড হেস্টিংস** দাবি করেছিলেন যে, ভারতীয় বাজার **থেকে ১০ কোটি গ্রাহক** পাওয়া সম্ভব। এই ঘটনাটি **'ন্যারেটিভ কলোনাইজেশন' বা বর্ণনামূলক ঔপনিবেশিকতার ব্যাপক**তাকে তুলে ধরে, যেখানে বিশ্বব্যাপী সাবস্ক্রিপশন মডেলকে চাঙ্গা করতে সাধারণ মানুষের জীবনকে স্ট্রিমিং কন্টেন্টের সাথে বুনে দেওয়া হচ্ছে।

খননযোগ্য সত্তার নৈতিক প্রভাব

বাণিজ্যিক মুনাফার উদ্দেশ্যে মানুষের অস্তিত্বকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা মর্যাদা এবং স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে গভীর নৈতিক উদ্বেগ তৈরি করে:

- **পণ্যকরণের মাধ্যমে অমানবিকীকরণ:** বন্ধুত্ব এবং পারিবারিক সম্পর্কের মতো পবিত্র মানবিক বন্ধনগুলোকে বাজারজাতযোগ্য কাঁচামালে রূপান্তর করা মানুষের অস্তিত্বকে নিছক অর্থনৈতিক উপযোগিতায় নামিয়ে আনে।
- **নৈতিক কর্তৃত্বের অবক্ষয়:** একজন অখণ্ড ব্যক্তির পরিবর্তে তাকে যখন অ্যালগরিদমিক ডেটাবেস এবং ক্রেডিট স্কোরের এক অস্থির সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন স্বাধীন নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- **সম্মতির অভাব:** মানুষের গভীরতম অনুরাগ এবং ক্ষণস্থায়ী সামাজিক সম্পর্কগুলোর এই নিয়মতান্ত্রিক খনন প্রায়শই অনুমতি ছাড়াই করা হয়, যা স্বায়ত্তশাসন এবং ডিজিটাল সম্মতির মৌলিক নীতিগুলোকে লঙ্ঘন করে।
- **মানবিক দুর্বলতার শোষণ:** বীরত্ব, বঞ্চনা কিংবা আত্মত্যাগের গল্পের নিরন্তর খোঁজ মূলত বৈশ্বিক বিনোদনের স্বার্থে মানুষের ট্রমা (মানসিক আঘাত) এবং কষ্টকে পণ্যে রূপান্তরিত করতে উৎসাহিত করে।
- **মানবিক আবেগের কৃত্রিম প্রতিস্থাপন:** মানুষের সহজাত বিচারবুদ্ধি এবং আবেগপ্রবণতাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা অনুকরণ করার ফলে একটি নৈতিক সংকট তৈরি হয়, যেখানে রোবট বা বটগুলো মুনাফার উদ্দেশ্যে মানুষের আবেগ নিয়ে কারসাজি করার সুযোগ পায়।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের কৌশল

- **সামাজিক সার্বভৌমত্বের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো তৈরি করা জরুরি, যাতে মানুষের গভীরতম আবেগ এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে স্পষ্ট অনুমতি বা সীমা লঙ্ঘন করে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা না যায়।
- **আখ্যান নিষ্কাশন বাজার নিয়ন্ত্রণ:** স্থানীয় অস্থিরতা বা মানসিক আঘাতকে বৈশ্বিক বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করা রুখতে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্ম এবং সংবাদ সংস্থাগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।
- **পরিচয় এবং ব্যক্তিসত্তার সুরক্ষা:** একজন ব্যক্তিকে অ্যালগরিদমিক ডেটাবেসের সমষ্টিতে পরিণত করা প্রতিরোধ করতে পদক্ষেপ নিতে হবে; একজন ব্যক্তির অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন পরিচয়ের আইনি অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- **AI-এর আবেগীয় অনুকরণের শাসন:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাতে মুনাফার উদ্দেশ্যে মানুষের আবেগ এবং সহজাত বিচারবুদ্ধিকে কবজা করতে না পারে, সেজন্য বৈশ্বিক নৈতিক মানদণ্ড (Global ethics standards) তৈরি করতে হবে।
- **গোপনীয়তার মূল্য পুনরুদ্ধার:** ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল পণ্যকরণের বিরুদ্ধে গোপনীয়তা, অন্তরঙ্গতা এবং বিশ্বাসের সামাজিক গুরুত্ব ফিরিয়ে আনতে সাংস্কৃতিক ও আইনি পরিবর্তন প্রয়োজন।

উপসংহার

'খননযোগ্য সত্তা'র উদ্ভব একটি গভীর রূপান্তরকে নির্দেশ করে, যেখানে মানুষের গল্প এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো পুঁজিবাদী শোষণের প্রাথমিক চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করছে। প্রযুক্তি একদিকে যেমন নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি একজন ব্যক্তিকে বাজারজাতযোগ্য কাঁচামালে পরিণত করছে। এই সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবকেন্দ্রিক সামাজিকতা এবং অখণ্ড ব্যক্তিসত্তাকে রক্ষা করাই বর্তমান ডিজিটাল সভ্যতার প্রধান চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্ন: *মানুষের গল্পের বাণিজ্যিকীকরণ ক্ষতি, আবেগপূর্ণ শ্রম এবং আত্মীয়তার শোষণ নিয়ে গুরুতর নৈতিক উদ্বেগ তুলে ধরে। মানুষের জীবনকে একটি 'খনিযোগ্য পণ্য' হিসেবে গণ্য করার নৈতিক প্রভাবগুলো আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video